শিশুদের খিঁচুনি ২
শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ৩
জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ ৬
হাড়ের ক্ষয় ও ভঙ্গুরতা ৮

ICDDR,B
CENTRE
FOR HEALTH AND
POPULATION RESEARCH

স্বাস্থ্য সংলাপ

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ

বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৩ চৈত্র ১৪১১

কলেরা মহামারী ক্ষণস্থায়ী হয় কেন

স্বাস্থ্য সংলাপ রিপোর্ট

বহু যুগ ধরে কলেরা এমন একটি রোগ হিসেবে চিহ্নিত, যা ভয়াবহ মহামারী আকারে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সময়ে-সময়ে দেখা দিতে পারে। কিন্তু রোগ-তত্ত্ববিদেরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে আসছেন: কলেরা মহামারীর ব্যাপ্তিকাল খুব বড় নয়। বাংলাদেশের মতো গ্রীস্মপ্রধান দেশেও সাধারণত বছরের কেবল দু'টি মৌসুমে এ-রোগ দেখা দেয় এবং এমনি-এমনি যেকোনো মহামারীর সমাপ্তিও ঘটে। কোনো কোনো বছর রোগটি দেখাও দেয় না। ব্যাপ্তিকাল যত ছোটই হোক স্বল্পসময়ের মধ্যেই কোনো কোনো কলেরা মহামারী অতীতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, যদিও বর্তমানে বিভিন্ন জাতের স্যালাইনসহ উন্নত চিকিৎসা-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের ফলে কলেরা রোগে মৃত্যুর হার অনেক কমে এসেছে এবং মহামারী দেখা দিলেও মানুষ এখন আর অতীতের মতো আতঙ্কিত হয় না।

একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমণের পর কলেরা মহামারী কেন এমনি-এমনি থেমে যায় এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নানা মত পোষণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন: অনেক লোকের দেহেই কলেরায় আক্রান্ত না-হওয়ার মতো রোগ প্রতিরোধক্ষমতা রয়েছে। এই প্রতিরোধক্ষমতা তারাই অর্জন করে যাদের শরীরে জীবাণু ঢুকেছিলো কিন্তু রোগ দেখা দেয় নি। যাদের দেহে এই প্রতিরোধক্ষমতা নেই, কেবল তারাই আক্রান্ত হয় এবং এমন ব্যক্তিদের দেহে সংক্রমণ শেষ হলে কলেরা মহামারী এমনি-এমনি থেমে যায়। এই বিশ্বাসের বিপরীতে অন্য অনেকে মনে করেন: কলেরা-জীবাণূর বাহক হিসেবে প্রাকৃতিক পানিতে 'প্লাঙ্কটন' নামের যে অণুজীব রয়েছে তার জীবনচক্র ও বংশবৃদ্ধির গতিবিধির ওপরই কলেরা মহামারীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আরো সহজ কথায়: পানিতে জীবাণুবাহক প্লাঙ্কটন-এর পরিমাণ যত বেশি হবে কলেরা জীবাণুর পরিমাণও তত বেশি থাকবে। অতএব মৌসুম শেষে প্রাকৃতিক পানিতে প্লাঙ্কটন-এর পরিমাণ কমে গেলে কলেরা-জীবাণুও মরে যায় বা নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং মানুষের শরীরে তা সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। ফলে মহামারীর সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় সব জীবাণুই শেষ হয়ে যায় না। অনেকগুলো সুপ্ত অবস্থায় বেঁচে থাকে এবং পরের বছর বা কয়েক বছর পর প্লাঙ্কটন বৃদ্ধির মৌসুমে জীবাণুগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত বাহক পেয়ে আবারও সতেজ হয়ে ওঠে এবং নতুন মহামারীর জন্ম দেয়।

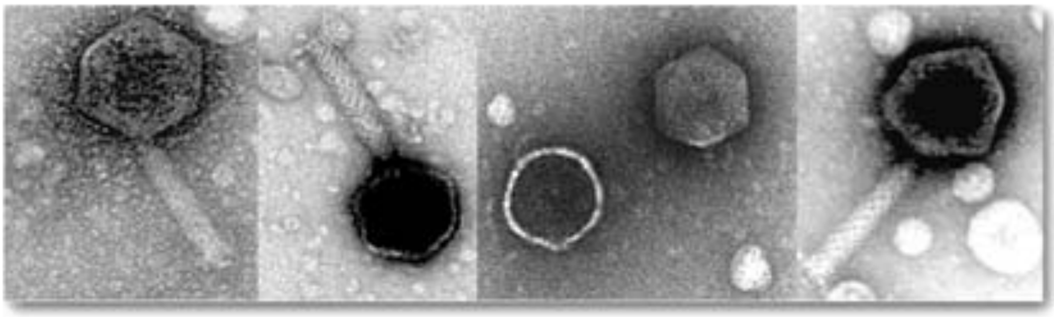

কলেরা-জীবাণু ভিব্রিও কলেরি'র অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল ফাজ

সম্প্রতি আইসিডিডিআর,বি'র বিজ্ঞানী ড. এস এম ফারুক-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণায় উপরোল্লিখিত বিষয়ে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। আইসিডিডিআর,বি'র কয়েকজন সহকর্মী, ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এন্টারিক ডিজিজেজ ও হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কয়েকজন বিজ্ঞানী এই গবেষণাকর্মে তাঁকে সহায়তা করেছেন। তাঁরা হলেন: ইফতেখার বিন নাসের, এম জহিরুল ইসলাম, এ এস জি ফারুক, এ এন ঘোষ, জি বি নায়ার, ডেভিড স্যাক এবং জন ডে ম্যাকালেনোস। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিডিংস্ অফ দ্য ন্যাশনাল একাডেমী অফ সায়েন্সেস নামের বিশ্বখ্যাত জার্নালে [২০০৫ ফেব্রুয়ারি ১;১০২(৫):১৭০২-৭] এই গবেষণাকর্মের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

উপরোক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কলেরার জীবাণু *ভিব্রিও কলেরি*'র শরীরে 'কলেরা ফাজ' নামের একধরনের ভাইরাস জন্ম নেয়, যারা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে একসময়ে তাদের বাহক অর্থাৎ কলেরা-জীবাণুকে মেরে ফেলে। কলেরা মহামারী যতই তুঙ্গে উঠতে থাকে ততই 'ফাজ' ভাইরাসগুলো দ্রুত তাদের বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে তাদের বাহকের অর্থাৎ কলেরা-জীবাণুর ধ্বংস-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। কোনো মহামারীর প্রাথমিক পর্যায়ে কলেরা-জীবাণুর সংখ্যা থাকে বেশি এবং 'ফাজ'-এর সংখ্যা থাকে কম, কিন্তু মহামারী যতই এগুতে থাকে ততই ঘটনাটি ঘটে এর বিপরীত: ধীরে ধীরে জীবাণু-বিনাশকারী ভাইরাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে। জীবাণু-আক্রান্ত মানুষের শরীরে, এমনকী তাদের মল-বমির বর্জ্য-প্রবাহেও এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কলেরা-জীবাণুর এই ক্রমাগত সংখ্যা হ্রাসের কারণে একসময়ে মহামারী বন্ধ হয়ে যায়।

কলেরা মহামারীর ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য কোন ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য তা বলার সময় এখনও আসে নি, তবে আইসিডিডিআর,বি'র সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল নিঃসন্দেহে একটি নতুন চিন্তার উদ্রেক করেছে। চূড়ান্ত বিবেচনায় হয়তো দেখা যাবে: পূর্বোক্ত দু'টি বিশ্বাস (অধিকাংশ মানুষের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ও প্লাঙ্কটন-সংক্রান্ত ধারণা) এবং সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য কোনোটাই এককভাবে কলেরা মহামারীর ক্ষণস্থায়িত্বের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। এই তিন প্রক্রিয়ার সম্মিলিত প্রভাবেই হয়তো কলেরা মহামারী হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। বিষয়টি খুবই জটিল। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণায় প্রাপ্ত নতুন তথ্য এই জটিলতার গ্রন্থিমোচনে সহায়ক হবে। কলেরা ফাজ যদি কলেরা-জীবাণুর ধ্বংসের জন্য কার্যকর বলে প্রমাণিত হয় তবে রোগীদের মল-বমির বর্জ্য-প্রবাহে এবং জীবাণু দ্বারা দূষিত পানিতে 'ফাজ' প্রয়োগ করে আরো স্বল্পসময়ে কলেরা মহামারী থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে জনস্বাস্থ্যের 'ত্রাস' হিসেবে বিবেচিত কলেরা মহামারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

CENTRE
FOR HEALTH AND
POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টিবিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নত মানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	ডেভিড এ. স্যাক
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম. শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এম.এ. রহীম

সদস্য
আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী,
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল,
মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মাসুমা আক্তার খানম,
সুমনা লিজা, মোঃ আনিসুর রহমান,
রুবহানা রকিব ও পিটার থর্প

মাস্ট হেড ডিজাইন	আসেম আনসারী
ডেস্কটপ প্রসেসিং ও প্রকাশনা	এম.এ. রহীম

প্রকাশক
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালি, ঢাকা ১২১২ (জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০)
বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২ ২৪৬৭, ৮৮১ ১৭৫১-৬০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৯৮৯ ৯২২৫ ও ৮৮২ ৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

মুদ্রণ: সেবা প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালি, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

শিশুদের খিঁচুনি

সাঈদা হক

খিঁচুনি শিশুদের একটি মারাত্মক স্বাস্থ্যসমস্যা। রোগটি আমাদের অনেকের কাছে পরিচিত হলেও এর অন্তর্নিহিত কারণ, প্রকারভেদ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অবহিত নই।

মস্তিস্কে স্নায়ুর অস্বাভাবিকত্বের কারণে শিশুদের খিঁচুনি হয়ে থাকে। অধিক তাপমাত্রা, অক্সিজেন ঘাটতি ও কোনো কোনো সংক্রমণের ফলে শরীরের ভিতরে সৃষ্ট বিষাক্ত (টক্সিক) পদার্থ খিঁচুনির সঙ্গে জড়িত। শিশুদের খিঁচুনি এমন একটি রোগ যা তাদের শারীরিক সমস্যাসহ পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যারও কারণ হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ৫ বছর বয়সের মধ্যে কোনো শিশুর অন্তত একবার খিঁচুনি হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ। শিশুদের খিঁচুনিকে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

যে কয়েক ধরনের খিঁচুনি শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার মধ্যে জ্বরজনিত খিঁচুনি (ফেব্রাইল কনভালসান) সবচেয়ে বেশি হতে দেখা যায়। শতকরা ২৮ থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে এধরনের খিঁচুনি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং ১৪-১৫ মাস বয়সে এর সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।

জ্বরজনিত খিঁচুনিতে শরীরের বাহ্যিক তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায় (৩৯° সেলসিয়াস-এর অধিক হয়), কয়েক সেকেন্ড থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত খিঁচুনি স্থায়ী হয়। যদি খিঁচুনির স্থায়িত্ব ১৫ মিনিট অতিক্রম করে তবে তাকে অ্যাটাইপিকেল (বিশেষ শ্রেণীর) খিঁচুনি বলা হয়ে থাকে।

ছবি: ইন্টারনেট

খিঁচুনির ফলে শিশুদের মস্তিস্কের স্নায়ুতন্ত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে খিঁচুনি দেখা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। জ্বরজনিত খিঁচুনি-রোগীদের শতকরা ৩ ভাগ পরবর্তী কালে মৃগী রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কোনো শিশু যদি ঘন-ঘন খিঁচুনিতে ভোগে, তবে পরবর্তী কালে তার মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পেলে এই সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। শতকরা ৩০-৫০ ভাগ শিশুর ক্ষেত্রে পরিণত বয়সে খিঁচুনির পুনরাবৃত্তি দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এ-রোগের পুনরাবৃত্তির পেছনে বংশগতিরও সম্পর্ক রয়েছে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে ও যথাযথ নিয়ম-কানুন মেনে চললে পরবর্তী কালে এ-রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ৮০-৯০ ভাগ কমে যায়।

শিগেলা নামক জীবাণুর ফলে সৃষ্ট রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত শিশুদেরও খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, *শিগেলা*-আক্রান্ত শতকরা ৫-৬ ভাগ শিশুর খিঁচুনি হয়। *শিগেলা*-জীবাণুর ফলে শরীরে নিউরোটক্সিন নামের যে বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয় তার ফলেই খিঁচুনি দেখা দেয়। ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া রোগেও খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। সাধারণ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের যদিও খিঁচুনি সচরাচর দেখা দেয় না, তবুও এর সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বার-বার খিঁচুনি হলে এবং সঠিক চিকিৎসা না-করলে ভবিষ্যতে খিঁচুনির পুনরাবৃত্তির ফলে শিশুর প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যায়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, চিকিৎসাপ্রাপ্ত খিঁচুনি রোগের শিশুদের ক্ষেত্রে মানসিক ও দৈহিক বিকাশ এবং পড়াশুনায় তেমন কোনো অসুবিধা দেখা দেয় না। অতএব যথাসময়ে এ-রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং এ-বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ

চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও জাতীয় কার্যক্রমের রূপরেখা

নন্দিতা নাজমা

আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। সমস্ত জনগোষ্ঠীর ১৭.১ ভাগই পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশু। এদের মৃত্যুর হার প্রতিহাজারে প্রায় ১০০ জন। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে যেসব কারণে শিশুদের মৃত্যু ঘটে, সেগুলো হলো: অপুষ্টি, ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, নবজাতকের ধনুষ্টংকার, ইত্যাদি। পাঁচ বছরের কম-বয়সী ৩০ ভাগ শিশুর মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হলো শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ। প্রতিবছর প্রায় দেড় লক্ষ শিশু এ-রোগে মারা যায়। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত শিশুরোগীদের শতকরা ৪০-৬০ ভাগ আসে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের কারণে। শিশুরোগীদের শতকরা ৩০-৪০ ভাগ হাসপাতালে ভর্তি হয় শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের কারণে। আমাদের দেশে একটি শিশু গড়ে বছরে ৩ থেকে ৮ বার এ-রোগে আক্রান্ত হয়। যদিও এই সংক্রমণের হার পৃথিবীর সব দেশেই সমান, তবুও উন্নত দেশগুলোতে সময়মত চিকিৎসা হয় বলে এ-রোগে মৃত্যুর হার অনেক কম।

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ কী

নাক থেকে ফুসফুস পর্যন্ত শরীরের অংশটুকুকে বলা হয় শ্বাসতন্ত্র। রোগজীবাণু দ্বারা শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ হলে তাকে বলা হয় শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ বা একিউট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (এআরআই)। নিউমোনিয়া বলতে ফুসফুসের সংক্রমণকে বোঝায়।

শ্বাসতন্ত্রের রোগ বলতে আমরা যেসব অবস্থাকে বুঝি সেগুলো হলো:

- সর্দি-কাশি
- ফ্যারিনজাইটিস
- ওটাইটিস মিডিয়া
- এপিগ্লটাইটিস
- ল্যারিনজাইটিস
- ব্রংকিওলাইটিস
- ব্রঙ্কাইটিস
- নিউমোনিয়া, ইত্যাদি

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের জন্য কারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ

- জন্মকালীন কম-ওজনের শিশু
- যেসব শিশু বুকের দুধ ঠিকমত পায় না
- যে-শিশুরা অপুষ্টির শিকার
- যাদের ৬টি রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয় নি
- যাদের ভিটামিন এ-এর অভাব রয়েছে
- ঘনবসতিপূর্ণ জায়গায় যারা বসবাস করে
- স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে যারা বসবাস করে
- সিগারেটের ধোঁয়ার সংস্পর্শে থাকে
- কাঠের চুলার ধোঁয়ার সংস্পর্শে থাকে

সারণি ১. শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের লক্ষণ এবং সেমতে যা যা করণীয়

০-২ মাসের শিশুদের ক্ষেত্রে		
লক্ষণ	**শ্রেণী**	**ব্যবস্থাপনা**
শ্বাস নেবার সময় বুক ভেতরের দিকে দেবে যায় না এবং দ্রুত শ্বাস বের হয় না (শ্বাসের গতি প্রতিমিনিটে ৬০-এর নিচে)	নিউমোনিয়া নয় (সর্দি-কাশি)	কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই, তবে শিশুটিকে নিম্নবর্ণিত উপায়ে সেবাযত্ন দিতে হবে: ● শিশুকে ঘনঘন বুকের দুধ খাওয়াতে হবে ● শিশুকে উষ্ণ রাখতে হবে ● সর্দির জন্য নাক বন্ধ থাকলে তা পরিস্কার করতে হবে যদি নিচের যেকোনো ১টি লক্ষণ দেখা যায়, তবে শিশুটিকে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে: ● শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হলে ● শ্বাস দ্রুত হলে ● খাওয়াতে সমস্যা দেখা দিলে ● শিশু খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে
শ্বাস নেবার সময় বুকের খাঁচার নিচের অংশ ভেতরের দিকে খুব বেশি দেবে যায় অথবা দ্রুত শ্বাস নেয় (প্রতিমিনিটে ৬০ বা তারও বেশি	মারাত্মক নিউমোনিয়া	● শিশুকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে ● শিশুকে উষ্ণ রাখতে হবে ● এন্টিবায়োটিকের প্রথম ডোজ দিয়ে দিতে হবে
● ভালোভাবে খায় না ● খিঁচুনি হয় ● অস্বাভাবিক ঘুম-ঘুম ভাব দেখা দেয় বা সহজে ঘুম ভাঙানো যায় না ● শান্ত অবস্থায় শ্বাসকষ্টের শব্দ (শাঁই শাঁই শব্দ) শোনা যায় ● জ্বর আছে অথবা শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম	খুব মারাত্মক রোগ	● খুবই জরুরী ভিত্তিতে শিশুকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে ● শিশুকে উষ্ণ রাখতে হবে ● এন্টিবায়োটিকের প্রথম ডোজ দিয়ে দিতে হবে
২ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে		
● শ্বাস নেবার সময় বুক ভেতরের দিকে তেমন দেবে যায় না ● শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত নয়	নিউমোনিয়া নয় (সর্দি-কাশি)	● বাড়িতে রেখে শিশুটির যত্ন নিতে হবে ● জ্বর থাকলে তার চিকিৎসা দিতে হবে ● যদি কাশি ৩০ দিনের বেশি থাকে তাহলে সঠিক রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করতে হবে
● শ্বাস নেবার সময় বুক ভেতরের দিকে তেমন দেবে যায় না ● শ্বাস দ্রুত হয়	নিউমোনিয়া	● শিশুকে বাড়িতে রেখে এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা দিতে হবে* ● জ্বর থাকলে জ্বরের ওষুধ দিতে হবে। শিশুটিকে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য ২ দিন পর ডাক্তার দেখাতে হবে ● ২ দিন পর যদি অবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটে অথবা যদি মারাত্মক নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে হাসপাতালে পাঠাতে হবে
● শ্বাস নেয়ার সময় বুক ভেতরের দিকে দেবে যায়	মারাত্মক নিউমোনিয়া	● জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে পাঠাতে হবে ● প্রথম ডোজ এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিতে হবে ● জ্বরের জন্য ওষুধ দিতে হবে
● পানীয় দ্রব্য গ্রহণে অপারগতা দেখায় ● খিঁচুনি হয় ● অস্বাভাবিক ঘুম-কাতর বা সহজে জাগানো যায় না ● শান্ত অবস্থায় শ্বাসকষ্টের শব্দ শোনা যায় ● অতিরিক্ত পুষ্টিহীনতা দেখা দিয়েছে	খুবই মারাত্মক রোগ	● জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে পাঠাতে হবে ● প্রথম ডোজ এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিতে হবে ● জ্বরের চিকিৎসা দিতে হবে ● শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা দিতে হবে

** সারণি ৪ অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে*

সারণি ২. নিউমোনিয়ায় ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার

ওষুধের প্রকার ও নাম	কাজ	কার্যকারিতা
এন্টিবায়োটিক ● এমক্সিসিলিন ● কোট্রাইমক্সাজল ● পেনিসিলিন	● রোগের মেয়াদ কমাবে ● জটিলতা হ্রাস পাবে	কার্যকর
প্যারাসিটামল	জ্বর কমাবে	কার্যকর
স্টেরয়েড	জ্বর কমাবে	ক্ষতিকর

সারণি ৩. সর্দি-কাশিতে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার

লক্ষণ	ওষুধের প্রকার ও নাম	কার্যকারিতা
জ্বর	প্যারাসিটামল	++
সর্দি	এন্টিহিস্টামিন	০
নাক-বন্ধ	ডিকনজেস্ট্যান্ট	+
কাশি	এক্সপেকটোরেন্ট	০
অসুখের মেয়াদ কমাতে ওষুধের ভূমিকা	এন্টিবায়োটিক ভিটামিন সি মাল্টিভিটামিন জিঙ্ক এবং অন্যান্য	০ ০ ০ ০

সারণি ৪. শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিক-এর মাত্রা

ওষুধের নাম	মাত্রা	চিকিৎসার মেয়াদ
কোট্রাইমক্সাজল	(ট্রাইমেথোপ্রিম) ৮-১০ মি.গ্রা./কেজি/প্রতিদিন, ১২ ঘণ্টা অন্তর (দুই ডোজ ভাগ করে মুখে সেব্য)	৭ দিন
বেনজাইল পেনিসিলিন	২৫০০০-৪০০০০ ইউনিট/কেজি/ডোজ, পেশীতে বা শিরায় ৬ ঘণ্টা অন্তর	৭ দিন
প্রোকেইন পেনিসিলিন	৫০০০০ ইউনিট/কেজি, পেশীতে প্রতিদিন ১ বার করে	৭ দিন
এমক্সিসিলিন	৪০ মি.গ্রা./কেজি/প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা অন্তর (তিন ডোজে ভাগ করে মুখে সেব্য)	৭ দিন

- গাড়ি ও কল-কারখানার ধোঁয়ার সংস্পর্শে যাদের সময় কাটে

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণই শিশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। এই মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯০ সালে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আমাদের দেশে ১৯৯২ সাল থেকে সরকার শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু করেছে এবং এই নীতিমালা অনুসরণ করে চলেছে।

নীতিমালার উদ্দেশ্য

- গ্রাম-পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, প্যারামেডিকগণ দ্রুত রোগ নির্ণয় করতে পারবে
- দ্রুত যথোপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করতে পারবে
- মারাত্মক নিউমোনিয়া ও খুব মারাত্মক রোগ হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির জন্য রোগী পাঠাতে পারবে
- এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে
- অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর চিকিৎসায় শিশুমৃত্যুর হার কমে যাবে

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের শ্রেণীবিন্যাস

সঠিক চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগকে শিশুর বয়স অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। শিশুর বয়স ০-২ মাস হলে এ-রোগকে খুব মারাত্মক রোগ, মারাত্মক নিউমোনিয়া এবং নিউমোনিয়া নয় (সর্দি-কাশি)-এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে। শিশুর বয়স ২ মাস থেকে ৫ বছর হলে খুব মারাত্মক রোগ, মারাত্মক নিউমোনিয়া, নিউমোনিয়া এবং নিউমোনিয়া নয় (সর্দি-কাশি)–এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। সর্দি-কাশি কমাতে এন্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই, বরং বিনা কারণে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের ফলে পরবর্তী কালে সংশ্লিষ্ট রোগীর জন্য ঐ এন্টিবায়োটিক অকার্যকর হয়ে ওঠে। তাই অযৌক্তিক এন্টিবায়োটিক ব্যবহার রোধ করতে হবে।

প্রতিরোধ

সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি নিউমোনিয়া প্রতিরোধে নিচে উল্লেখিত উপায়গুলো সম্পর্কে পরিবারের সকলকে সচেতন করে তোলা আবশ্যক:

- মাকে গর্ভাবস্থায় অধিক খাবার দিতে হবে
- শিশুর জন্মের আধা ঘণ্টার মধ্যে শালদুধ দিতে হবে
- সন্তান প্রসবের সাথে-সাথে নবজাতককে কাপড় বা কাঁথা দিয়ে ভালোভাবে জড়িয়ে উষ্ণ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে
- ০-৫ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে
- ৫ মাস থেকে শিশুকে সুষম বাড়তি খাবার দিতে হবে
- ৬ মাস পরপর ভিটামিন এ খাওয়াতে হবে
- যথাসময়ে ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা দিতে হবে
- পর্যাপ্ত দরজা-জানালা রেখে ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে
- শিশুর ঘরে ধূমপান করা যাবে না
- শিশুর ঘরে কয়লার চুলা বা আগুন জ্বালানো যাবে না
- ঘরের মেঝে, বিছানা ও কাপড়-চোপড় সবসময় শুকনা রাখতে হবে
- পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করতে হবে

উপসংহার

১৯৯০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য সংস্থার সকল সদস্য দেশের জাতীয় কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। এই রূপরেখার ভিত্তিতে ১৯৯২ সাল থেকে জাতীয় কর্মসূচি চালু হওয়ার কারণে ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ১৮০ থেকে ১০০-এ নেমে এসেছে। তথাপি আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত বেশি। শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ শ্বাসতন্ত্রের রোগ। বাংলাদেশে প্রতিবছর যে সাড়ে চার লক্ষ ৫ বছরের কম-বয়সী শিশু মারা যায় এর মধ্যে দেড় লক্ষই শ্বাসতন্ত্রের রোগের কারণে। প্রতিটি শিশুমৃত্যুর কারণে এক একটি পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে। শিশুমৃত্যুর এই উচ্চ হার দেশের পরিবার পরিকল্পনাতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অর্থনীতিতেও পড়ে এর নেতিবাচক প্রভাব। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, পিতামাতার শিক্ষার সাথে শিশুমৃত্যুর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের জাতিকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে। শুধু সংখ্যাতত্ত্বে শিক্ষিতের হার বাড়ালেই চলবে না। সত্যিকার অর্থে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শ্বাসতন্ত্রের রোগ ও অন্যান্য কারণে শিশুমৃত্যু রোধ করার জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে। সকল স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের সক্রিয় এবং স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো স্বাস্থ্য কর্মসূচিই সফল হতে পারে না।

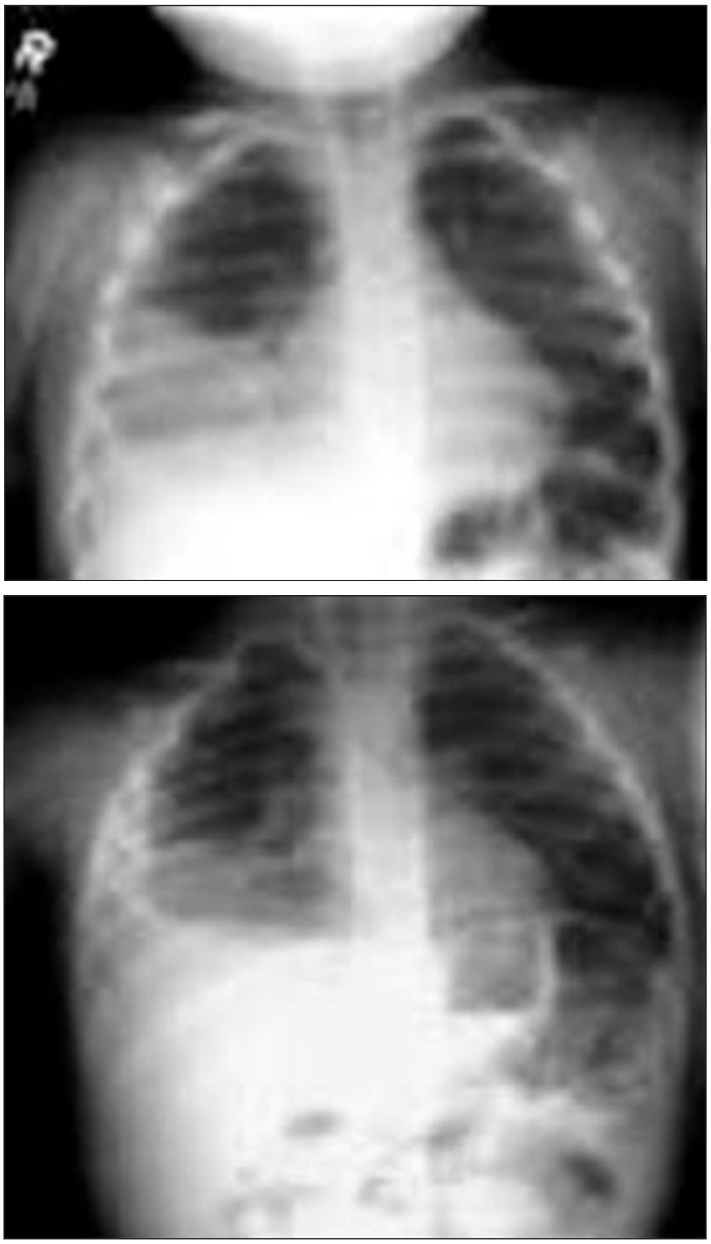

নিউমোনিয়া-আক্রান্ত শিশুরোগীর ফুসফুসের দু'টি এক্স-রে চিত্র (ছবি: ইন্টারনেট)

For updating your knowledge on health, population and nutrition research

subscribe to high-quality peer-reviewed quarterly

Journal of Health, Population and Nutrition

(ISSN 1606-0997)

The Journal disseminates findings of well-designed studies conducted by professionals working in developing countries, highlights the interactions among infectious diseases, population, and nutrition, and informs others of new research and advances. The Journal generally covers the following key topics:

Health systems; maternal, child and family health; perinatal, infant and child mortality; impacts of infections on health and foetal outcomes; sexually transmitted diseases; reproductive health; immunization and vaccines in developing countries; public health and health equity; emerging and re-emerging diseases; nutrition and child development; and demographic transition

Annual Subscription Rates (including mailing cost) for 2005

Tk 2,000.00* for institutions and Tk 1,500.00 for individuals

**Tk 3,000.00 for international organizations, multinational companies, donor agencies, embassies, other foreign and funded organizations, private health institutions, including private medical colleges, and private universities in Bangladesh*

Bank Draft or Pay Order should be issued in favour of:

"International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh"

All correspondence regarding subscriptions should be addressed to:

Managing Editor
Journal of Health, Population and Nutrition
ICDDR,B: Centre for Health and Population Research
GPO Box 128, Dhaka 1000 (Mohakhali, Dhaka 1212)
Email: jhpn@icddrb.org; phone: +(880-2)-882 2467
Fax: +(880-2)-989 9225 or +(880-2)-882 3116

Foreign subscribers must pay in US dollar, Pound Sterling, or Euro at a different rate not shown here

জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ

সঠিক গ্রহীতা বাছাইকরণ

মনোয়ার জাহান

জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচলিত সব পদ্ধতিই সবার জন্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সঠিক পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দানের জন্য তাই কারা কোন পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উপযোগী তা নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এ-নিবন্ধে প্রচলিত সব ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বর্ণনাসহ কোন পদ্ধতি কোন দম্পতির জন্য উপযোগী সে-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অধিকাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে

সন্তান ধারণে সক্ষম কোনো মহিলার ডিম্বাশয়ে অসংখ্য ডিম জমা থাকে। ডিম্বাশয় থেকে প্রতিমাসে একটি ডিম পরিপক্ক হয়ে ডিম্ববাহী নালী দিয়ে জরায়ুর দিকে আসে। এই পরিপক্ক ডিমটি যদি পুরুষের শুক্রকীটের সাথে মিলিত হয় তাহলে গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে। শুক্রকীটের সাথে মিলিত না হলে পরিপক্ক ডিম মাসিকের রক্তস্রাবের সাথে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো পদ্ধতি দ্বারা ডিমকে পরিপক্ক হতে না দিলে বা পরিপক্ক ডিম ও শুক্রকীটের মিলনে বাধা সৃষ্টি করা গেলে গর্ভসঞ্চার হতে পারে না। যেসব উপায়ে এই বাধা সৃষ্টি করা যায় তা হলো:

- ☐ ডিম ও শুক্রকীটকে মিলিত হতে না-দেওয়া
- ☐ ডিমকে পরিপক্ক হতে না-দেওয়া এবং ডিম্বস্ফোটন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা
- ☐ ডিম ও শুক্রকীট মিলিত হয়ে যে ভ্রুণের সৃষ্টি হয় সেটিকে জরায়ুতে স্থাপিত হতে না-দেওয়া

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ এবং কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও সব দম্পতির জন্য সব পদ্ধতি উপযুক্ত নাও হতে পারে। তাই তাদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া খুবই জরুরী যাতে দম্পতিগণ ভালোভাবে জেনে এবং বুঝে এগুলোর মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দমত এবং উপযুক্ত একটি পদ্ধতি বেছে নিতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করার আগে নিজ এলাকার পরিবার-পরিকল্পনা কর্মীর কাছে অথবা নিকটবর্তী পরিবার-পরিকল্পনা ক্লিনিক থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়ার সাথে সাথে ঐ পদ্ধতি তাদের জন্য উপযুক্ত কি না সে-বিষয়ে অবশ্যই জেনে নেওয়া দরকার। বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রহীতাদের যখন একটা স্বচ্ছ ধারণা হবে তখনই তাদের পক্ষে একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়া সহজ হবে।

যেসব জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বা পদ্ধতি দোকানে, পরিবার-পরিকল্পনা ক্লিনিকে বা সরকারি ও বেসরকারি পরিবার-পরিকল্পনা কর্মীর কাছে পাওয়া যায় সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. অস্থায়ী পদ্ধতি: খাবার বড়ি, কনডম. ইনজেকশন, আইইউডি ও নরপ্ল্যান্ট

খ. স্থায়ী পদ্ধতি: লাইগেশন ও ভ্যাসেকটমি

খাবার বড়ি

মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি অস্থায়ী পদ্ধতি হলো খাবার বড়ি। বাংলাদেশে এই বড়ি বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। মায়া, ওভোস্ট্যাট, ওভাকন, নরকোয়েস্ট, মারভেলন, সুখী, ইত্যাদি নামের স্বল্পমাত্রার খাবার বড়ি পাওয়া যায়।

মায়া
সুখী
Norquest

বাংলাদেশে মায়া, ওভোস্ট্যাট, ওভাকন, নরকোয়েস্ট, মারভেলন, সুখী, ইত্যাদি নামের স্বল্পমাত্রার খাবার বড়ি পাওয়া যায়

খাবার বড়ি যেভাবে কাজ করে

খাবার বড়িতে যে এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন নামক দু'টি উপাদান আছে তা প্রধানত যে তিনটি উপায়ে কাজ করে তা হলো:

- ☐ ডিম্বস্ফোটন বন্ধ রাখে
- ☐ জরায়ুর মুখে শ্লেষ্মাকে ঘন করে যার ফলে শুক্রকীট ডিম্বনালীতে প্রবেশ করতে পারে না এবং ভ্রুণের সঞ্চার হয় না
- ☐ নিষিক্ত ডিম্বকে জরায়ুতে স্থাপিত হতে দেয় না

কারা খাবার বড়ি খেতে পারে

- ☐ বেশিরভাগ মহিলার জন্য খাবার বড়ি একটি নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি
- ☐ নববিবাহিতা এবং আপাতত সন্তান চায় না এমন মহিলা
- ☐ দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান চায় এমন মহিলা

কারা খাবার বড়ি খেতে পারবে না

- ☐ অতিরিক্ত মাথাব্যথা, চোখে ঝাপসা-দেখা, ইত্যাদি সমস্যা থাকলে
- ☐ যাদের পায়ের শিরা ফোলা এবং তা থেকে ব্যথা হয়
- ☐ গর্ভবতী বলে সন্দেহ হলে
- ☐ ছোট সন্তানের বয়স ৬ মাসের কম হলে এবং তাকে এখনও বুকের দুধ খাওয়ানো হলে
- ☐ বয়স ৪০ বছরের বেশি হলে
- ☐ গত এক বছরের মধ্যে জন্ডিস হয়ে থাকলে
- ☐ ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে এমন মহিলা
- ☐ গত ৩ মাসের মধ্যে ২ মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হয়ে থাকলে
- ☐ যেকোনো স্তনে শক্ত চাকা/দলা থাকলে

বড়ি যেভাবে খেতে হবে

বড়ির প্রতিটি পাতায় সাধারণত ২১টি সাদা জন্মরোধক বড়ি এবং ৭টি খয়েরী রঙের বড়ি বা আয়রন বড়ি থাকে।

- ☐ প্রথমবারের মত বা নতুন করে খাবার বড়ি আরম্ভ করা হলে মাসিক হবার প্রথম দিন থেকে খাওয়া শুরু করতে হবে
- ☐ প্রতিদিন একটি করে ২১ দিনে ২১টি সাদা বড়ি দিকনির্দেশিত পথ ধরে খেতে হবে
- ☐ এর পর ১টি করে ৭দিন ৭টি খয়েরী বড়ি খেতে হবে
- ☐ খয়েরী রঙের বড়ি খাওয়াকালীন অবস্থায় সাধারণত মাসিক স্রাব হবে
- ☐ মাসিক শেষ হোক বা নাহোক খয়েরী রঙের বড়ি শেষ হবার পরদিন থেকেই একটি নতুন পাতা থেকে উপরে বর্ণিত নিয়মে পুনরায় সাদা বড়ি খাওয়া শুরু করতে হবে
- ☐ কোনো কোনো বড়ির পাতায় শুধুমাত্র ২১টি সাদা বড়ি থাকে। এক্ষেত্রে ২১ দিনে ২১টি বড়ি খেতে হবে। এরপর ৭ দিন বড়ি খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে। এ-সময়ে গ্রহীতার মাসিক স্রাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাত দিন পর মাসিক স্রাব বন্ধ হোক বা না হোক নতুন একটি পাতা থেকে পুনরায় বড়ি খেয়ে যেতে হবে।
- ☐ প্রতিদিন একই সময়ে বড়ি খাওয়ার অভ্যাস করা ভালো

বড়ি খেতে ভুলে গেলে যা করতে হবে

- ☐ একদিন বড়ি খেতে ভুলে গেলে তার পরদিন মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটি এবং নির্ধারিত সময়ে আরও একটি বড়ি খেতে হবে অর্থাৎ সেদিন দু'টি বড়ি খেতে হবে
- ☐ দু'দিন বড়ি খেতে ভুলে গেলে তার পরের দু'দিন দু'টি করে বড়ি একসাথে থেতে হবে এবং এই বড়ির পাতা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বড়ির সাথে অন্য একটি পদ্ধতি, যেমন কনডম ব্যবহার করতে হবে
- ☐ তিনদিন যদি বড়ি খেতে ভুল হয়, তবে এই বড়ির পাতা থেকে বড়ি খাওয়া বন্ধ করতে হবে এবং পরবর্তী মাসিক না-হওয়া পর্যন্ত কনডম ব্যবহার করতে হবে। পুনরায় মাসিক শুরু হলে মাসিকের প্রথম দিনেই একটি নতুন পাতা থেকে বড়ি খাওয়া শুরু করতে হবে

ইনজেক্শন

ইনজেক্শন এখন বাংলাদেশের মহিলাদের কাছে একটি জনপ্রিয় অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। পদ্ধতিটি সহজ, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ। বাংলাদেশে বর্তমানে ডিপোপ্রভেরা ও নরিস্ট্যারেট নামে দু'টি ইনজেক্শন পাওয়া যায়।

ইনজেক্শন গর্ভনিরোধের ক্ষেত্রে যেভাবে কাজ করে

- ☐ ডিম্বাশয়ে ডিম পরিপক্ক হতে বাধা দেয়
- ☐ জরায়ুর মুখে নিঃসৃত রসকে ঘন ও আঠালো করে, যার ফলে শুক্রাণু ডিম্বনালীর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না
- ☐ জরায়ুর ভিতরের পরিবেশ বা দেয়ালকে শুক্রাণু ও ডিমের মিলন ঘটার অনুপযোগী করে তোলে। তাই যদি কোনো ডিম শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়েও থাকে, তবু তা জরায়ুতে থাকার ও পূর্ণাঙ্গতা পাওয়ার মত পরিবেশ পায় না

কারা ইনজেক্শন নিতে পারে

- ☐ যারা নিয়মিত বড়ি খেতে প্রায়ই ভুলে যায় অথবা প্রতিদিন বড়ি খাওয়াকে ঝামেলা মনে করে
- ☐ যাদের বড়ি খেলে অসুবিধা হয় বা বড়ি ব্যবহার নিষেধ

- ☐ যাদের বাচ্চা বুকের দুধ খাচ্ছে
- ☐ দীর্ঘদিন কিংবা আর কোনোদিন সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা নেই কিন্ত বন্ধ্যাকরণের ব্যাপারেও মনস্থির করতে পারছে না
- ☐ যার কমপক্ষে ১টি সন্তান আছে

কারা ইনজেক্শন নিতে পারবে না

- ☐ গত ৩ মাসের মধ্যে দুই মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হলে
- ☐ প্রায়ই প্রচণ্ড মাথাব্যথা হলে
- ☐ স্তনে কোনো সন্দেহজনক চাকা বা ক্যান্সার থাকলে
- ☐ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে
- ☐ হৃদরোগ থাকলে
- ☐ গর্ভবতী বলে সন্দেহ হলে
- ☐ গত ১ বছরে জন্ডিস হয়ে থাকলে

কনডম কারা ব্যবহার করতে পারে

- ☐ যেকোনো সক্ষম পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কনডম ব্যবহার করতে পারে
- ☐ যেসব দম্পতি কোনো শারীরিক কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে না তারা অনায়াসে কনডম ব্যবহার করতে পারে
- ☐ স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যদি কারো বা উভয়ের যৌনরোগ থেকে থাকে তবে তাদের একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে রোগ বিস্তার রোধের জন্য কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী অথবা এক-নাগাড়ে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে চায় না তখন কনডম অত্যন্ত উপযুক্ত
- ☐ যার স্ত্রী নববিবাহিতা, সন্তান প্রসব করেছে বা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে এবং অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করছে না
- ☐ যে-পুরুষের স্ত্রী দূরে থাকে এবং মাঝে মাঝে মিলিত হয়
- ☐ যার স্ত্রী পরপর দুই বা বেশি দিন খাওয়ার বড়ি খেতে ভুলে গেছে, মাস শেষ হওয়ার বাকি দিনগুলো স্বামী কনডম ব্যবহার করতে পারে

আইইউডি

ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিভাইস–যাকে সংক্ষেপে আইইউডি বলা হয়–মহিলাদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী অস্থায়ী নিরাপদ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। জরায়ুর ভেতরে এটি স্থাপন করতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি আইইউডি হচ্ছে কপার-টি ৩৮০-এ। এর কার্যকারিতার মেয়াদ ১০ বছর। বর্তমানে আরও দুই ধরনের আইইউডি পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে চালু রয়েছে, যার মেয়াদ ৩-৫ বছর।

বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় আইইউডি হলো কপার-টি, যা নারীর জরায়ুতে লাগিয়ে দেওয়া হয়

আইইউডি যেভাবে কাজ করে

- ☐ শুক্রকীট পরিভ্রমণে বাধা দেয়, যার ফলে শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না
- ☐ ডিম্বকে নিষিক্তকরণে বাধা দেয়
- ☐ জরায়ুর গায়ে ভ্রূণ স্থাপিত হতে দেয় না
- ☐ দীর্ঘমেয়াদী (প্রকারভেদে ৩ থেকে ১০ বছর) পদ্ধতি বলে এটি গ্রহণ করলে প্রতিদিন বা প্রতিবার অন্য কিছু ব্যবহারের ঝামেলা থাকে না। যেকোনো সময়, যেকোনো কারণে ক্লিনিকে কিংবা হাসপাতালে গিয়ে খুলে ফেলা যায় এবং খুলে ফেলার পর সন্তান ধারণ ক্ষমতা দ্রুত ফিরে আসে

আইইউডি কারা ব্যবহার করতে পারে

যে-মহিলা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে, অন্তত একটি সন্তানের মা হয়েছে, হরমোনজাতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে না, দীর্ঘদিন কিংবা আর কোনোদিন বাচ্চা নেওয়ার ইচ্ছা নেই কিন্তু বন্ধ্যাকরণের ব্যাপারেও মনস্থির করতে পারছে না তার জন্য আইইউডি একটি উপযোগী পদ্ধতি।

আইইউডি কারা ব্যবহার করতে পারবে না

- ☐ গর্ভাবস্থায় বা গর্ভাবস্থার সন্দেহ থাকলে
- ☐ যৌনরোগ, তলপেটের প্রদাহ, জরায়ুর মুখে ঘা থাকলে
- ☐ খুব বেশি রক্তাল্পতা থাকলে
- ☐ মাসিকের সময় ব্যথা, অতিরিক্ত অথবা অনিয়মিত মাসিক হলে
- ☐ অজ্ঞাত কারণে রক্তস্রাব হলে

নরপ্ল্যান্ট

নরপ্ল্যাট মহিলাদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এক সেট নরপ্ল্যান্টে ৬টি ছোট ছোট নরম চিকন ক্যাপসুল (প্রায় দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত) থাকে, যা একজন মহিলার বাহুর ভিতর দিকে, কনুইয়ের কিছু উপরে চামড়ার ঠিক নিচে স্থাপন করা হয়।

নরপ্ল্যান্ট যেভাবে কাজ করে

প্রতিটি নরপ্ল্যান্ট ক্যাপসুলের ভিতরে লিভোনোরজেস্ট্রেল (Levonorgestrel) নামক একরকম কৃত্রিম প্রজেস্টেরন হরমোন থাকে। শরীরে স্থাপনের পরপর ক্যাপসুলের ভিতর থেকে অল্পমাত্রায় এই হরমোন ধীরে ধীরে নিঃসৃত হতে থাকে। এই হরমোন ডিম্বস্ফোটন বন্ধ করে, জরায়ুর মুখের শ্লেষ্মাকে ঘন করে, ফলে শুক্রকীট ডিম্বনালীতে প্রবেশ করতে পারে না এবং গর্ভসঞ্চার হয় না।

নরপ্ল্যান্ট কারা ব্যবহার করতে পারে

যেসব মহিলা দীর্ঘদিনের জন্য জন্মবিরতি চায়, কমপক্ষে একটি সন্তান আছে, খাবার বড়ি ব্যবহার নিষেধ আছে বা বড়ি খেলে শারীরিক অসুবিধা হয়, কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক সন্তান থাকায় আর সন্তান চায় না অথচ বন্ধ্যাকরণ অপারেশন করতেও চায় না, এমন পদ্ধতি পছন্দ করেন না যা রোজ রোজ মনে করে ব্যবহার করতে হয় বা সহবাসের সময় পদ্ধতি ব্যবহার করা ঝামেলা মনে করে।

নরপ্ল্যান্ট কারা ব্যবহার করতে পারবে না

গর্ভবতী বলে সন্দেহ হলে, জন্ডিস থাকলে, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, যক্ষা, হৃদরোগ ও হাঁপানি থাকলে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ ভালো না-হওয়া পর্যন্ত নরপ্ল্যান্ট ব্যবহার করা যাবে না।

লাইগেশন

লাইগেশন মহিলাদের জন্য একটি স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। আগেই বলা হয়েছে যে, একজন প্রজননক্ষম মহিলার ডিম্বাশয় থেকে প্রতিমাসে একটি করে ডিম বের হয়ে তা ডিম্বনালী দিয়ে জরায়ুতে আসে। লাইগেশন করার সময় এ-নালী দু'টি আলাদাভাবে বেঁধে কিছু অংশ ফেলে দিতে হয়। এর ফলে ডিম্বাশয় থেকে ডিম ডিম্ববাহী নালী দিয়ে জরায়ুতে আসতে পার না এবং শুক্রকীটের সাথে মিলিত হতে পারে না। ফলে গর্ভধারণ সম্ভব হয় না। লাইগেশনের পর আর অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন থাকে না। তাই একে স্থায়ী পদ্ধতি বলে। তবে জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ পদ্ধতিতে নালীগুলোকে পূর্বের মত জোড়া লাগানো সম্ভব।

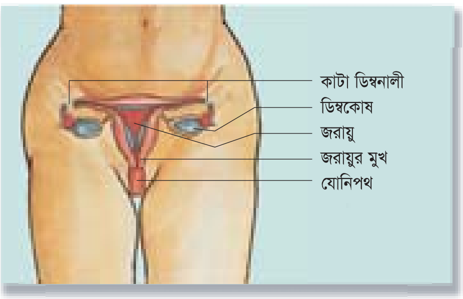

যে-দম্পতি আর সন্তান চায় না এবং যে-দম্পতির অন্তত দু'টি সন্তান আছে ও ছোট সন্তানের বয়স কমপক্ষে দুই বছর তারাই লাইগেশন করাতে পারে।

ভ্যাসেকটমি

ভ্যাসেকটমি পুরুষদের জন্য একটি স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। একজন প্রজননক্ষম পুরুষের অণ্ডকোষ থেকে শুক্রকীট তৈরি হয়। এরপর শুক্রকীটগুলো দু'টি নালী দিয়ে প্রবাহিত হয়, যা সহবাসের সময় বীর্যের সাথে নির্গত হয়। যে-নালী দু'টি দিয়ে শুক্রকীট প্রবাহিত হয় তাদেরকে শুক্রকীটবাহী নালী বলে। ভ্যাসেকটমি করার সময় এ-নালী দু'টি আলাদাভাবে বেঁধে কেটে দেওয়া হয়, এর ফলে শুক্রকীট ডিমের সাথে মিলিত হতে পারে না এবং গর্ভসঞ্চার হয় না।

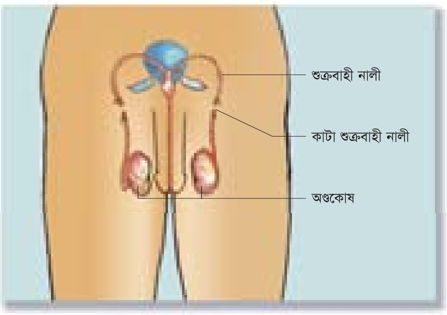

বর্তমানে দেশে ননস্কারপেল ভ্যাসেকটমি চালু হয়েছে। ননস্কারপেল ভ্যাসেকটমির ক্ষেত্রে অণ্ডকোষের থলির অংশ কাটার পরিবর্তে সামান্য একটু অংশ ফুটো করে অপারেশন সম্পন্ন করা হয়।

ভ্যাসেকটমি যাদের জন্য

- ☐ যেসব দম্পতি আর ছেলেমেয়ে চায় না, তাদের মধ্যে পুরুষ সঙ্গীটির জন্য এই পদ্ধতি খুবই ভালো
- ☐ যার স্ত্রী স্বাস্থ্যগত কারণে অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে অক্ষম
- ☐ যেসব দম্পতির অন্তত দু'টি সন্তান আছে এবং ছোট সন্তানের বয়স কমপক্ষে দুই বছর

কারা ভ্যাসেকটমি করতে পারবে না

- ☐ যাদের অনিয়ন্ত্রিত যক্ষা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস আছে (তবে চিকিৎসার পর এই রোগগুলো নিয়ন্ত্রিত হলে অপারেশন করা যায়)
- ☐ যাদের জন্ডিস আছে
- ☐ যাদের অপারেশনের জায়গায় মারাত্মক চর্মরোগ আছে

উপরোক্ত আলোচনায় এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো কোনো পদ্ধতি কোনো কোনো দম্পতির জন্য অধিকতর উপযোগী। কিন্তু নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে এমন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নয়, যা ক্ষতিকর হতে পারে। একমাত্র কনডম বাদে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো পদ্ধতিই গ্রহণ করা উচিত নয়।

ছবিসহ প্রতিবেদনটির সূত্র ঃ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

হাড়ের ক্ষয় ও ভঙ্গুরতা

সাবিনা আহমেদ

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে ২০৬টি অস্থি বা হাড় বিদ্যমান। হাড়ের গঠন খুবই বিচিত্র। কোনো কোনো হাড় কঠিন কিন্তু নমনীয়; অনেকগুলো হালকা কিন্তু মজবুত। জীবন্ত কোষ, টিস্যু ও প্রোটিন-তন্তু বা কোলাজেন এবং খনিজ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের স্ফটিকের সমন্বয়ে তৈরি হয় হাড়ের বাইরের স্তরটি। ভেতরের স্তরে থাকে মজ্জা বা বোন ম্যারো।

প্রোটিন-তন্তু দ্বারা নির্মিত কাঠামোয় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস-লবণ গ্রথিত অবস্থায় থাকে বিধায় ক্যালসিয়ামকে হাড়ের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করবার প্রধান চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মানবদেহে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থসমূহের মধ্যে ক্যালসিয়াম পরিমাণে সর্বাপেক্ষা বেশি, যার পরিমাণ মোট দেহের ভরের শতকরা ১.৫-২ ভাগ। সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে ১০০০-১২০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। এই বিপুল পরিমাণ ক্যালসিয়াম-এর ৯৯% পাওয়া যায় দাঁত এবং হাড়ে। দাঁত ও হাড়ে ক্যালসিয়াম ফসফেট আকারে জমা থাকে। ক্যালসিয়াম হাড়কে কাঠিন্য ও শক্তি দান করে এবং দৃঢ় করে।

বয়োসন্ধিক্ষণের বহু আগে থেকেই বেশিরভাগ হাড় তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং বয়োসন্ধি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৭৫-৮৫% হাড়ের গঠন প্রক্রিয়া শেষ হয়। এই অস্থি-গঠন প্রক্রিয়া নারীদের ক্ষেত্রে ২৫-৩০ বছর এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এই বয়সেই হাড়ের গড় ভর সর্বোচ্চ হয়ে থাকে। হাড়ের ক্ষয় বা ভঙ্গুরতা এমন একটি নীরব ঘাতক ব্যাধি যার কারণে দেহের হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং সহজেই ভেঙে পড়ে। এই ভাঙা হাড় সাধারণভাবে 'ফ্র্যাকচার' হিসেবে পরিচিত।

সার্বক্ষণিকভাবে অথচ খুব ধীরগতিতে হাড় থেকে ক্যালসিয়াম নির্গত হয়ে থাকে। তবে ক্যালসিয়াম হারানোর হার নির্ভর করে হাড়ের অবস্থান ও তার ভূমিকার ওপর। সাধারণত ভারবহনকারী হাড় যেমন: পিঠ ও পা বা কোমর-এর হাড় কয়েক মাসের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম হারায়। রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখবার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক নিয়মেই হাড় থেকে বিরতিহীনভাবে ক্যালসিয়াম নির্গত হতে থাকে। তাই রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ঠিক থাকলেও খাদ্যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতির ফলে হাড়ক্ষয়ের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পায়। এভাবেই প্রাথমিক পর্যায়ে অস্থিক্ষয় শুরু হয়। প্রতিবছর ২-৪% হাড় ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি হয়। কোনো ব্যক্তির অস্থিক্ষয়ের হার প্রতিস্থাপন হারের তুলনায় বেশি হওয়ার ফলে হাড় পাতলা ও দুর্বল হয়ে যায় এবং সহজেই ভেঙে পড়ে।

অস্থিক্ষয়ের কারণে শরীরের যেকোনো হাড়ই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কোমরের হাড় এবং মেরুদণ্ডের ভঙ্গুরতাই রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। কোমরের হাড়ের ফাটল বা ফ্র্যাকচার এমনই মারাত্মক হয় যে, রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তর করে শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। এ-জাতীয় রোগী অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাচল করতে পারে না, এমনকী তারা দীর্ঘকালীন বা স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে বেঁচে থাকে। এ-কারণে তাদের মৃত্যুও হতে পারে। ভঙ্গুর মেরুদণ্ডের কারণেও মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে, এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে: উচ্চতা হারানো, পিঠে মারাত্মক ব্যথা বা শারীরিক গঠনের অসামঞ্জস্যতা, যেমন কুঁজো হয়ে-যাওয়া, ইত্যাদি।

যেকোনো সময় এবং যেকোনোভাবে দুর্বল হাড়ে ফ্র্যাকচার বা ফাটল হতে পারে, যেমন: হঠাৎ পড়ে-যাওয়া, ভারী জিনিস উঠানো, হঠাৎ করে ঘুরে-দাঁড়ানো, নীচু হয়ে মেঝে থেকে খবরের কাগজ, ইত্যাদি তোলা, হাঁচি দেওয়া, চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলা, কোলাকুলি করা। কখনো কখনো স্বাভাবিক চলাফেরাও বিপজ্জনক হতে পারে।

অস্থিক্ষয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির কোমর বা কব্জির হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক অংশে বেড়ে যায়। সাধারণত মহিলারাই এ-রোগের শিকার হন তবে পুরুষরাও কম-বেশি এ-রোগে ভুগে থাকেন এবং এ-রোগে আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা নারীদের সংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ।

ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, দেহের গঠন ও আকার, সর্বোপরি পারিবারিক ইতিহাস সবই অস্থিক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। রজঃনিবৃত্তির পর মহিলাদের মধ্যে অস্থিক্ষয়ের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। চিকন এবং ফর্সা মহিলারা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ককেশীয়ান এবং এশিয়ান নারীরা আমেরিকান এবং হিসপানিক নারীদের অপেক্ষা বেশি মাত্রার ঝুঁকিতে থাকে।

অস্থিক্ষয়ের জন্য দায়ী নির্দিষ্ট কোনো জিন বা বংশগতির বাহক এখনও আবিস্কৃত হয় নি, বরং বিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন বংশগতি-সংক্রান্ত কারণের পাশাপাশি পরিবেশ ও জীবনযাত্রার ধরন-ধারণও এ-রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আবিস্কারের জন্য কোনো বিরাট জনগোষ্ঠীর ওপর সমীক্ষা চালানো প্রয়োজন।

প্রতিরক্ষা

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্তমানে অস্থিক্ষয়জনিত রোগের কিছু কিছু লক্ষণ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ও এড়িয়ে চলা সম্ভব। ঝুঁকির নির্ণায়কসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- ☐ ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি'র ঘাটতি
- ☐ নিস্ক্রিয় জীবন-যাপন
- ☐ ধূপপান, মদ্যপান
- ☐ গ্লুকোকর্টিকয়েডস, এন্টিকনভালসেন্টজাতীয় ওষুধ গ্রহণ
- ☐ ক্যাফিনজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ, যা খাদ্য থেকে ক্যালসিয়ামের শোষণ বাধাগ্রস্ত করে

সারণি: কিছু ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ

খাদ্যের নাম	ক্যালসিয়ামের পরিমাণ
১ গ্লাস (৮ আউন্স) দুধ	৩০০ মি.গ্রা.
২ আউন্স পনির	৫৩০ মি.গ্রা.
৬ আউন্স টক দই	৩০ মি.গ্রা.
৩ আউন্স বাদাম	২২০ মি.গ্রা.

সাধারণত অস্থিক্ষয়ের রোগী বা এ-রোগের প্রাথমিক লক্ষণযুক্ত রোগীকেও চিকিৎসকরা যেসব পরামর্শ দিয়ে থাকেন তা হলো:

ক. নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য ও ক্যালসিয়াম গ্রহণের সঙ্গে ভিটামিন ডি গ্রহণের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। ভিটামিন ডি অন্ত্র থেকে রক্তে এবং অতঃপর হাড়ে ক্যালসিয়াম বহন করে নিয়ে যায়। প্রাত্যহিক কাজে সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে আসার ফলে এবং ভিটমিন ডি-সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আমরা এই ভিটামিন পেতে পারি। তাছাড়া ভিটামিন এ, সি, ম্যাগনেসিয়াম এবং আমিষ-জাতীয় খাদ্য হাড় গঠনের জন্য প্রয়োজন।
খ. সুষম খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে দুধের ভূমিকা অপরিসীম।
গ. অত্যন্ত রোগা ও প্রবীণ ব্যক্তিকে ওজন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে এই ওজন তার কম ঘনত্বযুক্ত হাড়ের ভারসাম্য রাখতে পারে।
ঘ. ধূমপান, অতিরিক্ত চা-কফি ও মদ্যপান পরিত্যাগ করতে হবে।
ঙ. হরমোনের ব্যবহারও কেউ কেউ অনুমোদন করেন, যা টিস্যু তৈরিতে সহায়তা করে।
চ. সফলভাবে হাড়ের ওপর চাপ মোকাবেলা করতে হবে।
ছ. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথকভাবে ক্যালসিয়াম সেবন তেমন ক্ষতিকারক না-হলেও বেশি সময়ের জন্য উঁচুমাত্রায় ক্যালসিয়াম গ্রহণ কিডনীতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার দীর্ঘকাল ধরে অল্পমাত্রায় ক্যালসিয়াম গ্রহণের ফলে ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে অস্থিক্ষয়জনিত রোগ হতে পারে।

বয়স ও প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসকগণ রোগীকে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নির্ধারণ করে দেন। খাদ্য ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম গ্রহণ নিরাপদ বলে বিবেচিত এবং ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যকেই বেশি প্রধান্য দেওয়া উচিত।

শেষ কথা

কোনো মানুষের বর্তমানের খাদ্যের তালিকাই নির্ধারণ করে দেবে পরবর্তী জীবনে ক্যালসিয়াম ঘাটতির কারণে তার কতটুকু ভোগান্তি হতে পারে। তাই বুড়ো বয়সে হাড়ের বেদনায় কাতর না-হওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে হলে জীবনের প্রারম্ভেই কঠিন শক্ত হাড় গঠনে যত্নবান হতে হবে। যারা বয়সে এখনও নবীন তাদের জন্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের উদ্দেশে বলা যায়: বিভিন্ন ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ ও সঠিক ব্যায়াম ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে সারাজীবনের জন্য শক্ত ও মজবুত হাড় গঠনে যত্নবান হতে হবে।

ছবি: ইন্টারনেট

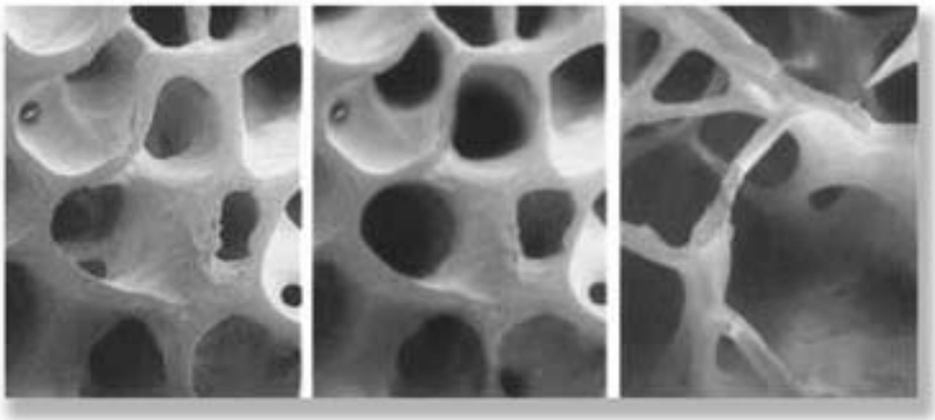

হাড়ের স্বাভাবিক গঠন *হাড়ক্ষয়ের প্রাথমিক পর্যায়* *হাড়ক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়*